গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১৩ সংখ্যা | ৫ - ১১ নভেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় মহান লেনিনের নেতৃত্বে ৭ থেকে ১৭ নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি বছরের মতো এ বারও বিপ্লবের ১০৪তম বার্ষিকী গভীর শ্রদ্ধা ও শপথের মধ্য দিয়ে পালন করছে বিশ্বের দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ। ভারতেও এই বিপ্লববার্ষিকী এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে। আশা করি লেনিনের এই রচনাটি রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

সোভিয়েত শাসনের দ্বিবার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়টি নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখার কথা আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু দৈনন্দিন কাজের বোঝায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশের প্রাথমিক প্রস্তুতির বেশি কিছু করা এ যাবৎ হয়ে ওঠেনি। সেইজন্যই উপরোক্ত বিষয়ে আমার মতে যা মূলকথা তার ছোটো সারার্থ হাজির করারচেষ্টা করব ঠিক করেছি। বলাই বাহুল্য, বক্তব্যের সারসংক্ষেপে বহু অসুবিধা থাকে, ত্রুটিও থেকে যায়। তথাপি একটা ছোট পত্রিকা-প্রবন্ধের পক্ষে এই পরিমিত লক্ষ্যটা হয়ত সাধ্যায়ত্ত হতে পারে প্রশ্নটির উপস্থাপনায় এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের আলোচনার জন্য একটা রূপরেখা তৈরিতে।

তত্ত্বের দিক থেকে কোনও সন্দেহই নেই যে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট উত্তরণ পর্ব বর্তমান। এই পর্বে এই উভয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুণ মিলিতভাবে না থেকে পারে না। এই উত্তরণ পর্বটা মুমূর্ষ পুজিবাদ ও উদীয়মান কমিউনিজমের মধ্যে, বা অন্য কথায়, পরাজিত, কিন্তু অবিলুপ্ত পুঁজিবাদ আর প্রসূত, কিন্তু তখনও নিতান্ত দুর্বল কমিউনিজমের মধ্যে সংগ্রামের একটা পর্ব না হয়ে পারে না।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরে কাশ্মীরের জনগণ কি আশ্বস্ত হলেন

সম্প্রতি তিন দিনের সফরে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি সভা করেছেন, নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সর্বত্রই তিনি সরকারি নীতির সাফল্যের কথা ফলাও করে বলেছেন। কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক অধিকার ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার ফলে কাশ্মীরের মানুষই লাভবান হয়েছেন, সেখানে শান্তি ফিরে এসেছে, এ দাবি তিনি প্রতিটি সভায় করেছেন।

কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি ও বাস্তব কি একই রকম? কাশ্মীরে উপস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন সন্ত্রাসকে গোড়া ধরে উপড়ে ফেলার ডাক দিচ্ছেন, তখনই সেখানে একের পর এক জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় নিহতের তালিকায় যেমন নিরীহ সাধারণ নাগরিকরা রয়েছেন, তেমন সেনা ও পুলিশকর্মীরাও রয়েছেন। শুধু অক্টোবরেই সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে ১২ জন সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন, ন'জন সেনাকর্মীর মৃত্যু ঘটেছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২০ জন পুলিশকর্মী নিহত হয়েছেন।

জম্মুর রাজৌরি-পুঞ্চ সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ এবং এনকাউন্টারে মৃত্যু দুই-ই সম্প্রতি বেড়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা ঠেকাতে নিয়মিত বাঙ্কারের সংখ্যা বাড়াতে হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তেমনই একটি বাঙ্কার ঘুরে দেখে এসেছেন এই সফরে। এর পরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ বলছেন কোন যুক্তিতে?

কাশ্মীর কতখানি শান্ত এবং নিরাপদ তা বোঝাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শের-ই-কাশ্মীর কনভেনশন সেন্টারে বক্তৃতার আগে পোডিয়ামে লাগানো বুলেটপ্রুফ কাচের ঘেরাটোপটি সরিয়ে দিয়েছেন। নিরাপত্তার লৌহবেষ্টনীর মধ্যে ওই কাচের ঘেরাটোপটি সত্যিই অপ্রয়োজনীয় অর্থে বেমানানই ছিল। তাঁর সফর উপলক্ষে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল গোটা কাশ্মীরকে। নিয়মিত বিপুল বাহিনী ছাড়াও ৫০ কোম্পানি বাড়তি আধাসামরিক বাহিনী, ৫০০০ ট্রুপারের সঙ্গে ছিল স্নাইপার, ড্রোন ও শার্পসুটাররা।

মোদি সরকারের দাবি ছিল, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর উপত্যকায় জঙ্গি সমস্যা কমবে, পরিবেশ স্বাভাবিক হবে এবং উন্নয়নের বন্যা বইবে। একের পর সংঘর্ষ এবং মৃত্যুর ঘটনা থেকে স্পষ্ট, পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেনি। কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপ এখনও কেন একই রকম থেকে গেল, এ প্রশ্নের কোনও উত্তর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর প্রতিটি বক্তৃতাতেই এড়িয়ে গেছেন। বরং পরিস্থিতিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টায় তিনি বলেছেন, 'রক্তপাতের দিন শেষ। আগামী দিন উন্নয়নের'। আসলে বাস্তবটাকে স্বীকার করে নিলে সরকারের ব্যর্থতা এবং ৩৭০ ধারা বাতিলের সাফল্য নিয়ে বাগাড়ম্বর দেশের মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবে বিপুল আর্থিক বিনিয়োগ দূরের কথা, ছিটেফোঁটা বিনিয়োগও কাশ্মীর, লাদাখ এমনকি জম্মুতেও আসেনি। আসার কথাও নয়। জঙ্গি কার্যকলাপের এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোনও বিনিয়োগ আসতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে মানুষ

তিনের পাতায়

সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি তুললেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা

সর্বভারতীয় সেভ এডুকেশন সম্মেলন

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতির জীবনে নতুন আঘাত নামিয়ে এনেছে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে। সরকার হিসেব কষেছিল দেশবাসীকে করোনা বিধির দাওয়াই দিয়ে আটকে রেখে, প্রতিবাদ-আন্দোলনের কোনও সুযোগ না দিয়ে শিক্ষার সার্বিক বাণিজ্যিকীকরণের নীল নকশা এভাবেই দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু না, সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দেশব্যাপী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি। দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করে ৩০-৩১ অক্টোবর সর্বভারতীয় সম্মেলনের ডাক দেয় অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি।

কোভিড পরিস্থিতির কারণে প্রথাগতভাবে একটি স্থানে সম্মেলনের আয়োজন না করে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হল, দিল্লির গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন হল এবং চেন্নাইয়ের মাপোসি আরাঙ্গাম হলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং অনলাইনে এই তিনটি কেন্দ্রের সমন্বয় করে সংগঠনের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউবে সম্প্রচার করা হয়। এই তিনটি কেন্দ্র ছাড়াও দেশের নানা স্থানে সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য ও শিক্ষানুরাগী মানুষেরা বিপুল উৎসাহে একত্রিত হয়েও বড় পর্দায় সম্মেলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন

চারের পাতায় দেখুন

ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত

বরোগুলিতে ডেপুটেশন এসইউসিআই(সি)-র

রাজ্য জুড়ে বাড়ছে ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যাও। ঘটছে মৃত্যু। অবিলম্বে এই সব রোগ প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ১ - ৩ নভেম্বর কলকাতার প্রায় সব বরোতেই দলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দলের পক্ষ থেকে পোস্টার, বিক্ষোভ, অটো প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে চলছে প্রচার কাজ। ছবি ঃ ১ নং বরো

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাশ্মীর সফর

একের পাতার পর

পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই কোনও কর্মসংস্থানও তৈরি হয়নি। বেকারি আকাশ ছুঁয়েছে। ফল বাগিচা, কার্পেট, শাল তৈরি, পর্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রও পুরো স্তব্ধ।

অন্য দিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলছেন, রক্তপাতের দিন শেষ, তখন একই সাথে বলছেন, সন্ত্রাস নির্মূল করতে এগিয়ে আসতে হবে কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায়কে। রক্তপাত যদি শেষই হয়ে গিয়ে থাকে তবে যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশে মন্ত্রীকে এমন আহ্বান জানাতে হচ্ছে কেন? কেন নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বসে বলতে হচ্ছে যে, সন্ত্রাস রুখতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করুন? কেন যুবকদের মধ্যে জেহাদি মনোভাবে রাশ টানার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথা বলতে হচ্ছে?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন একদিকে বলছেন, গণতন্ত্র তৃণমূল স্তরে পৌঁছেছে, জম্মু-কাশ্মীরের যুবকদের দায়িত্ব উন্নয়নের কাজে শামিল হওয়া এবং তিনি কাশ্মীরের যুবকদের বন্ধু হতে চান, ঠিক তখনই ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটে পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের পক্ষে উল্লাস প্রকাশ করায় শ্রীনগরে 'গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এর ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশ ইউএপিএ ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছে। একই ঘটনা দেখা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানার দুটি কলেজ হস্টেলে। সেখানে কাশ্মীরী ছাত্রদের উপর হামলা করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এই মনোভাব নিয়েই নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাশ্মীরের যুবকদের বন্ধু হতে চান! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখে এ কথা বললেও কাশ্মীরী কিশোর যুবকদের সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখে প্রশাসন এবং সশস্ত্র বাহিনী। বাস্তবে বিজেপি সরকার একদিকে ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরের জনগণের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ অধিকারগুলিকে পদদলিত করে তাদের ভাবাবেগে প্রবল আঘাত করেছে, অন্য দিকে পুলিশ-মিলিটারির বেয়নেট-বুটের তলায় তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ দমন করছে। আর এই দমনের খবর যাতে বাইরে প্রকাশিত না হয় তার জন্য সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকেও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সত্য তুলে ধরার চেষ্টা যে সাংবাদিকরা করছেন তাঁদের পুলিশি অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, জেলে যেতে হচ্ছে। প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে, সরকারের যে কোনও সমালোচনাকেই রাষ্ট্রবিরোধিতা হিসাবে দেখা হবে। সত্য তুলে ধরায় কেন তাঁদের এত বাধা? আসলে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের ঘোষণার উল্টো বাস্তবকে ধামাচাপা দিতেই এই সরকারি হুমকি।

এ ভাবে যে কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না, তা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ২০১৯-এর ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা বাতিলের দিনই স্পষ্ট করে বলেছিল বিবৃতিতে। বলা হয়েছিল, কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ও কাশ্মীরী জনগণের স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিতে হবে। পরিবর্তে বিজেপি সরকার যা করল তাতে আমাদের আশঙ্কা, কাশ্মীরের পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হবে এবং কাশ্মীরী জনগণের ভাবাবেগ চূড়ান্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে আরও সাহায্য করবে। পাকিস্তানকেও নাশকতাবাদী কার্যকলাপ চালাতে সাহায্য করবে। এস ইউ সি আই (সি)-র সেই আশঙ্কা আজ দুঃখজনক ভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।

বাস্তবে ভারতের স্বাধীনতার সময় স্বতন্ত্র ধারায় জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবস্থান করা কাশ্মীরের ভারতভুক্তির বাস্তব প্রয়োজনেই এসেছিল সংবিধানের ৩৭০ ধারা। কিন্তু একেবারে প্রথম থেকেই কংগ্রেস পরিচালিত তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭০ ধারাকে বারবার লঙ্ঘন করেছে। একের পর এক পদক্ষেপে এই ধারার প্রায় সমস্ত অধিকারই কংগ্রেস সরকার কেড়ে নিয়েছে— যা কাশ্মীরী জনগণের কাছে বিশ্বাসভঙ্গ হিসাবেই এসেছে। যা তাদের গোটা ভারতের সঙ্গে এক হয়ে মিলবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সবই কংগ্রেস করেছিল কাশ্মীরে ক্ষমতা দখল করার জন্য। এখন বিজেপি কংগ্রেসের পথেই সেই একই কাজ করছে।

এ বার কাশ্মীর সফরে অমিত শাহ সরকারি নীতির জয়গানের পাশাপাশি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি ক্রনোলজি টেনেছেন— আগে ডিলিমিটেশন (আসন পুনর্বিন্যাস), তার পর নির্বাচন এবং তার পর পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা। পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও আজ তাঁরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন, তা হলে সেদিন তাঁরা তা কেড়ে নিয়েছিলেন কেন? সেই কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভুল ছিল নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা কাশ্মীরের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তা স্বীকার করুন। আসলে জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা পুনর্বিন্যাসের কাজটি অমিত শাহরা এমনভাবে করতে চাইছেন যাতে জম্মুতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়ে উপত্যকার ক্ষমতা তারা দখল করতে পারেন। এটি বিজেপির দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা। কাশ্মীরের মানুষের আশঙ্কা, এই ভাবে বিজেপি উপত্যকার জনবিন্যাসের চরিত্রই পাল্টে দিতে চাইছে। কাশ্মীরিয়ত— যা তাদের নিজস্ব সত্তা, তা নষ্ট করে দিতেই এই পদক্ষেপ। বাস্তবে বিজেপি নেতারা একের পর এক পদক্ষেপে কাশ্মীরের মানুষকে কাছে টানার পরিবর্তে দূরেই ঠেলছেন।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের জেলা সম্মেলন

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৪ সেপ্টেম্বর কোলাঘাটের উত্তর জিঞাদা হাইস্কুলে। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের জেলা কমিটির উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সভাপতি মধুসূদন বেরা, সহ সভাপতি জ্ঞানানন্দ রায়, যুগ্ম সম্পাদক নেপাল বাগ, তপন কুমার আদক এবং এআইইউটিইউসি-র জেলা সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ মাজী। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় দু'শতাধিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে গত ২০২০ ও ২০২১ সালে রাজ্য সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে রেট বৃদ্ধি কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। সম্মেলন থেকে মধুসূদন বেরাকে সভাপতি, নেপাল বাগ ও তপন কুমার আদককে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩২ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

জীবনাবসান

দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর পূর্বতন সদস্য, প্রবীণ নেতা কমরেড নলিনীকান্ত প্রামাণিক বহু বছরব্যাপী বার্ধক্যজনিত নানা রোগের কারণে শয্যাশায়ী থেকে ৮ অক্টোবর হৃদরোগে জয়নগর মজিলপুরের বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

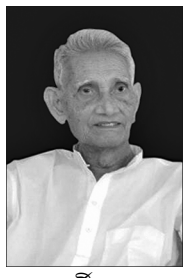

কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় সর্বহারার মহান নেতা, মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ ও প্রয়াত পলিটবুরো সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর আলোচনা শুনে প্রবলভাবে আলোড়িত হন। পরবর্তী কালে জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সাথে আলোচনার পর দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ৫০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে। প্রয়াত পলিটবুরো সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও সুবোধ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সেদিনকার কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে জনভিত্তিতে দাঁড় করাতে কমরেড ইয়াকুব পৈলান, আমিরালি হালদার, রেণুপদ হালদার, রবীন মণ্ডলদের মতো জেলার প্রথম সারির নেতাদের সাথে তিনিও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। শোষিত-নিপীড়িত চাষি-মজুরদের সংগঠিত করে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। জোতদার-কায়েমি স্বার্থবাদী-পুলিশ চক্রের নির্মম বাধাকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার বিঘা বেনাম জমি উদ্ধার করে চাষির হাতে বিলি করা, জমিতে বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, জোতদারদের চাপানো নানা শোষণমূলক প্রথা রদ করা, খেতমজুরদের মজুরিবৃদ্ধি আন্দোলনে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার হয়। দাবি আদায়ে বহু সাফল্যও অর্জিত হয়। বঞ্চিত, হতদরিদ্র-নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে ইজ্জতবোধ ও শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে, তত্ত্ব-আদর্শ চর্চা এবং দলের কর্মী সংগ্রহ করে তাদের সংগঠক হিসাবে তৈরি করার কষ্টসাধ্য ও ধৈর্যশীল প্রয়াসে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

চাষি-মজুরদের আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি দুষ্ট চক্রের রোষে পড়েন। এমনকি তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টাও হয়। নানা মিথ্যা মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন। কর্ডনিং প্রথায় পুলিশি দুরাচারের প্রতিবাদ করায় তাঁকে দু'মাস হাজতবাস করতে হয়। জেলায় এস ইউ সি আই (সি) -র সংগঠন ও আন্দোলন দমনে সিপিএম দীর্ঘকাল যে খুন-সন্ত্রাস চালিয়েছে, তেমন বহু ঘটনার মধ্যে একটি হল নলিনীবাবুর সংস্পর্শে থাকা চাপলায় কমরেড অনুকুল পাইকের বর্বর হত্যাকাণ্ড। ৬৬'র খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এলাকায় নলিনীবাবুর ভূমিকা ছিল প্রাণবন্ত ও তৎপর। রেশন ডিলারদের দুর্নীতি প্রতিরোধে গণআন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

তিনি নানা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। নিজ গ্রাম ঘোড়াদলে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই স্কুলেই শেষপর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ছাত্রদের জন্য সহজবোধ্য ইংরেজি গ্রামার বই লিখেছিলেন। স্কুলের ছাত্রকে বাড়িতে রেখে যোগ্য শিক্ষক তৈরি করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি দলকে শক্তিশালী করতে গ্রুপ রিডিং, স্টাডি সার্কেল, রাজনৈতিক ক্লাস, মনীষীদের জীবন চর্চা, কর্মীসভা, পথসভা, জনসভা, বিক্ষোভ-ডেপুটেশন ইত্যাদি কর্মসূচি রূপায়ণে উদ্যমী ভূমিকা নিয়েছেন। শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ে নানা প্রচেষ্টার সাথে এলাকার উন্নয়নের দাবিতে গণকমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী মন্ত্রী থাকাকালীন মথুরাপুর-ঘোড়াদল রোড নির্মাণের অনুমোদন, কমরেড রেনুপদ হালদার বিধায়ক থাকাকালীন ঘোড়াদল স্কুলের ও খেলার মাঠের অনুমোদন লাভ এই আন্দোলনেরই পরিণতি। এলাকার মানুষের মধ্যে অনেকেই তাকে অভিভাবক হিসাবে গণ্য করতেন।

৭০'র দশকের প্রথম দিকে দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে যায়।

'২৪ এপ্রিল', '৫ আগস্ট' সহ মার্কসবাদী শিক্ষকদের স্মরণ দিবসগুলিতে তিনি পরিবারের সকলকে নিয়ে মাল্যদানের অনুষ্ঠান করতেন। পরিবারের প্রায় সকলকেই দলের সাথে তিনি যুক্ত করেছেন। ৫৯'র খাদ্য আন্দোলন ও ৯০'র গণআন্দোলনের শহিদ কমরেড মাধাই হালদার স্মরণে ও দলের জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৩১ আগস্ট 'চাষি-মজুরদের অন্তহীন সংগ্রামের কথা' নামে বই প্রকাশ উপলক্ষে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে সভা হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ডাক্তারদের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐ সভায় উপস্থিত হন। এটাই তাঁর দলের কর্মসূচিতে শেষ অংশগ্রহণ।।

২২ অক্টোবর জয়নগর 'রূপ ও অরূপ' হলে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণসভা। দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, জ্ঞানচর্চার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও চাষি-মজুরদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁকে এই মহত্তর জীবনবোধে আকৃষ্ট করেছিল। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা স্মরণ করে বলেন, তাঁর চলে যাওয়ায় দুঃখ যদি পেয়ে থাকি, আবেগ যদি সত্যাশ্রয়ী হয়, তবে বিপ্লবের অপূরিত স্বপ্ন সত্যি কর্মে রূপায়িত করবো, আরও বেশি দায়িত্ব নেব, তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবো। এর মধ্যেই তাঁকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার নস্কর। রাজ্য কমিটির সদস্য জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কমরেড নলিনীকান্ত প্রামাণিক লাল সেলাম

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবী ৭৪ বর্ষ ১২ সংখ্যায় কাছাড় জেলা যুব সম্মেলনের ছবিটি ভুলক্রমে 'মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ চাঁচলে' সংবাদের সঙ্গে ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে মানুষ
সরকারের পরোয়া নেই

খাদ্যপণ্যের বাজারে আগুন লেগেছে। সর্ষের তেলের দাম আড়াইশো ছাড়িয়েছে। সাদা তেলও দ্রুতগতিতে সেদিকে ছুটছে। চাল-ডাল-গম-আটা কিংবা মাছ-মাংসের কথা নতুন করে না বলাই ভাল। ৫০-৬০ টাকার নিচে সবজির কিলো নেই। পেঁয়াজ ৫০ টাকা, আলু ২২ টাকা কিলো— দাম নাকি আরও বাড়তে চলেছে। গরিবি-বেকারিতে বিপর্যস্ত জীবনে এখন অতিমারি ও লকডাউনের গাঢ় অন্ধকার— চাকরি নেই, থাকলেও মাইনে অর্ধেক। তার ওপর এই ভয়ানক মূল্যবৃদ্ধিতে বাস্তবিকই দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না মানুষ। বাজার করতে গিয়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পাক খাওয়াই সার হচ্ছে। পকেটের সবটুকু ঢেলে দিয়েও থলে ভরছে না, কেনা জিনিসটুকু তলানিতেই পড়ে থাকছে।

মূল্যবৃদ্ধির এই চড়া আঁচে স্বাভাবিক ভাবেই ঝলসে যাচ্ছে মানুষ। এ বছরের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বা গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। এই সূচক অনুযায়ী ক্ষুধার্ত ও অপুষ্ট মানুষের সংখ্যায় পৃথিবীর ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারত দাঁড়িয়ে আছে ১০১-এ। উৎপাদন কম, এমন তো নয়! কিন্তু দাম এতটাই চড়া যে তা মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। টাকা ও অস্ত্রের জোরে এশিয়ার মধ্যে শক্তিধর দেশ হিসাবে পেশি ফোলায় যে ভারতের শাসক শ্রেণি, লজ্জার হলেও সত্য, অপুষ্টি ও ক্ষুধার নিরিখে তার স্থান এখন বাংলাদেশ, পাকিস্তানেরও নিচে!

দেশের মানুষের এই বেহাল দশা কি কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকারগুলির অজানা? গত কয়েক বছর ধরেই একের পর এক সমীক্ষা রিপোর্টে দেশের রুগ্ন ও ক্ষুধাতুর চেহারা তো বারবারই প্রকট হয়েছে! পঞ্চম জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষা দেখিয়েছে, গত পাঁচ বছরে শিশু-অপুষ্টি ক্রমাগত বেড়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিত্যদিনের ব্যবহার্য পণ্যের জন্য আগের চেয়ে অনেকটাই কম খরচ করছেন মানুষ। করোনা অতিমারি কয়েক কোটি মানুষের কাজ কেড়ে নিয়েছে। অর্ধেক বেতনে, কিংবা নিতান্ত সামান্য টাকার বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন অগণিত মানুষ। মহিলাদের কর্মহীনতা বিরাট আকার নিয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছেন আরও কয়েক কোটি মানুষ।

এই অবস্থায় যখন কেনার ক্ষমতা তলানিতে ঠেকে না-খেয়ে মরতে বসেছে দেশের অধিকাংশ মানুষ, তখন এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে সরকার কী করেছে? এক কথায় বলা যায়, কিছুই করেনি। শুধু তাই নয়, এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির জন্য আসলে দায়ী বৃহৎ পুঁজিপতিদের মুনাফা অটুট রাখার একমাত্র কাজে নিবেদিতপ্রাণ সরকারই।

কেন এ কথা বলা, তা ব্যাখ্যার আগে দেখে নেওয়া যাক, সাম্প্রতিক খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির পিছনে কারণগুলি কী কী। প্রথমত, পেট্রল, বিশেষত ডিজেলের আকাশছোঁয়া দাম। এর দরুন পরিবহণ খরচ বেড়েছে। ফলে বেড়েছে খাদ্যপণ্যের দাম। অসময়ের বৃষ্টিতে অনেক ফসল, বিশেষত শাক-সবজি নষ্ট হয়েছে। পণ্যের জোগান কমেছে বাজারে। ফলে দাম চড়েছে। দাম বৃদ্ধির আর একটি কারণ, লকডাউন ও অতিমারির কারণে বিক্রি কমে যাওয়ায় মুনাফা বজায় রাখতে ব্যবসায়ীদের যেমন খুশি দাম নেওয়া। ফলে চাষিরা দাম না পেলেও বাজারে দাম চড়ছে।

এছাড়া বিজেপি সরকারের রাতারাতি নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষত ছোট ব্যবসায়ীরা প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। পরিণামে বাজারে খাদ্যপণ্য জোগান দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যুক্ত বহু মানুষের ব্যবসা লাটে উঠেছে। এর ওপর অতিমারি ও আচমকা জারি করা লকডাউনের কারণে খাদ্যপণ্য জোগানের গোটা শৃঙ্খলটাই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এই গোটা বিষয়টির সম্পূর্ণ দায়ভার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ছাড়া আর কারও নয়।

মূল্যবৃদ্ধির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কৃষিপণ্য ক্ষেত্রটিতে যত বেশি করে কর্পোরেট পুঁজিপতিরা প্রবেশ করছে, ততই বাড়ছে দাম। ডাল, ভোজ্য তেলের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি লক্ষ করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যায়। কয়েক মাসের মধ্যে ভোজ্য তেলের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ খাদ্যপণ্যের ওপর কর্পোরেট পুঁজিপতিদের কব্জা নিয়ন্ত্রণ করা দূরে থাক, তা আরও শক্তিশালী করতে নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যক পণ্য আইন সংশোধন করেছে। খাদ্যপণ্য মজুত করার ঢালাও সুযোগ তুলে দিয়েছে বিপুল পুঁজির মালিকদের হাতে। খাদ্যপণ্য মজুত করে রেখে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে এই বড় ব্যবসায়ীরা দেদার বাড়িয়ে চলেছে সেগুলির দাম।

মূল্যবৃদ্ধির যন্ত্রণায় জেরবার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতি সরকারের যদি এতটুকু দরদ থাকত, তাহলে পেট্রল ও ডিজেলের আকাশছোঁয়া দাম ঠেকাতে তারা কি শুল্ক ও সেসের বিরাট অঙ্কের চেহারা খানিকটা হলেও ছোট করত না? আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির এই দুর্দিনে একটা নির্বাচিত সরকারের কাছে মানুষ তো এটুকু আশা করতেই পারে। কারণ, এ কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য মূল দায়ী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাপানো শুল্ক ও সেস। তেলের দাম বাড়লে সরকারের রাজকোষের পাশাপাশি ফুলে ফেঁপে ওঠে তেল-কোম্পানিগুলির মুনাফা। আর মূল্যবৃদ্ধির বোঝায় আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে সাধারণ মানুষের নুয়ে-পড়া পিঠ।

এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি রুখতে সরকার কি পারত না মজুতদারি নিয়ন্ত্রণে কঠোর হতে? পারত না কি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যগুলির দামের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দিতে? তাদের কি উচিত ছিল না মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে জারি করা বিধিনিষেধ পালিত হচ্ছে কি না, তা নিয়ে কঠোর নজরদারি চালানো? এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারেরও দায় কিছু কম নয়। কয়েক বছর আগে রাজ্যে তৃণমূল সরকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বিরাট ঢাক-ঢোল পিটিয়ে 'টাস্কফোর্স তৈরি করেছিল। কয়েকবার বাজারে বাজারে ঢুঁ মেরে টাস্কফোর্স সেই সময় নিজের অস্তিত্ব জাহিরও করেছিল। মানুষ প্রশ্ন তুলছে, আজকে এই ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির দুর্দিনে কোথায় তাঁরা? কোথায় গেল রাজ্যের মানুষকে ভালো রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি? কোথায় কেন্দ্রীয় সরকারের তথাকথিত আচ্ছে দিন?

আসলে খেটে-খাওয়া মানুষ, দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশটি দখল করে রয়েছেন যাঁরা, তাঁদের ভাল-মন্দ, জীবন-মরণের প্রতি কি কেন্দ্র কি রাজ্য— কোনও সরকারেরই কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রে, দেশের আসল মালিক পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ তারা। তাই মানুষ মরছে মরুক, সরকারের কিছু যায় আসে না। তারা ব্যস্ত খাদ্যপণ্যের ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির মালিকদের প্রবেশের ঢালাও সুযোগ করে দিতে। তার জন্য আইন পাল্টে ফেলতেও দু'বার ভাবেনি তারা।

এই অসহনীয় পরিস্থিতির অবসানের দাবিতে খেটে-খাওয়া মানুষের জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বাঁচার রাস্তা নেই। সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে জনস্বার্থবিরোধী সরকারগুলির বিরুদ্ধে দাবি তুলতে হবে— 'খাদ্যপণ্যের দাম কমাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নাও', 'বড় পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে খেটে-খাওয়া মানুষের ঘাড়ে কোপ বসানো চলবে না'। আন্দোলনের প্রবল চাপই একমাত্র পারে এই নির্লজ্জ সরকারগুলিকে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করতে।

জীবনাবসান

বাঁকুড়ার লক্ষ্মণপুর আঞ্চলিক কমিটির কর্মী কমরেড অমলেন্দু মণ্ডল উচ্চ রক্তচাপ ও লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। '৭০-এর দশকের শেষদিকে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। শুরু থেকেই দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি ধারাবাহিক অংশ নিতেন। দলের উদ্যোগে স্থানীয় পঞ্চায়েতে শাসক সিপিএম বিরোধী নাগরিক কমিটি গড়ে তুলতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ওই সময় নিজ গ্রামসভায় নির্বাচনে জয়ী হন এবং সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে পঞ্চায়েতে সরব ছিলেন। নিষ্ঠা, সততা এবং সারল্য তাঁর স্বকীয় গুণ ছিল। পরিবারের সকলকে দলের সমর্থকে পরিণত করেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল দলের নেতা-কর্মীদের অনায়াস যাতায়াতের জায়গা।

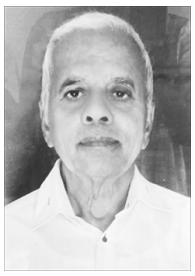

৯ অক্টোবর তাঁর গ্রাম চাঁদড়ায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্মী সমর্থক সহ দলের আঞ্চলিক এবং জেলা নেতৃবৃন্দ তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড অমলেন্দু মণ্ডল লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাসবিহারী আলিপুর আঞ্চলিক কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড গোপাল দাস পদ্মপুকুরে তার মেয়ের বাড়িতে ১৬ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পাওয়া মাত্র আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড দিলীপ হালদার ও অন্য সদস্যরা সেখানে যান ও তাঁর মরদেহ দলের আঞ্চলিক অফিসে আনা হয়। পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য কমরেড শিবাজী দে, এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক অশোক পালিত, সিপিআইয়ের পক্ষে পারমিতা দাশগুপ্ত, সহ দলের বহু নেতা কর্মী সংগঠক তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন।

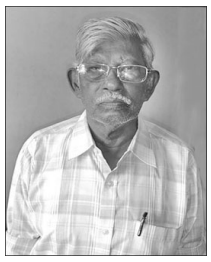

কমরেড গোপাল দাস ষাটের দশকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ে বসবাস করার সময় এস ইউ সি আই (সি) দলের বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। ৬৬ সালে কলকাতার চেতলা অঞ্চলে তিনি চলে আসেন প্রবল দারিদ্র্য সাথে নিয়ে। তখন তিনি শ্যামাপ্রসাদ কলেজে ভর্তিও হন। সে সময় চেতলায় পার্টির সাথে যোগাযোগ করেন। পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর নির্দেশে কমরেড দাস দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক অঞ্চলে দল প্রতিষ্ঠিত শরৎ স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নামে অবৈতনিক স্কুলে প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই সূত্রেই তিনি শিক্ষক সংগঠন বিপিটিএ-র সাথে যুক্ত হন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। পার্টির চেতলা আঞ্চলিক কমিটির সদস্য থাকাকালীন তিনি এলাকার বহু কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। চেতলা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ওয়ার্ড নিয়ে রাসবিহারী আলিপুর আঞ্চলিক কমিটি গঠন হওয়ার পরে এই কমিটির সদস্য হিসাবে সাংগঠনিক বহু দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সকলের সাথে বিশেষত ছোটদের সাথে তাঁর খুবই আবেগময় এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক অত্যন্ত দরদি স্নেহশীল ও মূল্যবোধসম্পন্ন কর্মীকে।

৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় চেতলা নাইন বি বাসস্ট্যান্ডের একটি হলে তার স্মরণসভা হয়। এলাকার বহু বিশিষ্ট মানুষ তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। মূল বক্তব্য রাখেন দলের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড করুণা ভট্টাচার্য।

কমরেড গোপাল দাস লাল সেলাম

হুগলি জেলা যুব সম্মেলন

ভয়াবহ বেকারি, সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিদ্বেষ ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ৩ অক্টোবর রিষড়া মেনকা ভবনে অনুষ্ঠিত হল এআইডিওয়াইও-র প্রথম হুগলি জেলা সম্মেলন। সম্মেলনে শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই (সি)-র হুগলি জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পবন মজুমদার। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল। কমরেড সুমন ঘোষকে সভাপতি, কমরেড শিমুল বর্মনকে সম্পাদক ও কমরেড সুকান্ত পালকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৭ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

স্কুল কলেজ খুলছে। ছাত্র আন্দোলনের জয়

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলনের জয়ে সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানাল সংগঠন। এআইডিএসও কলেজ স্ট্রিটে মিছিল (ছবি) ও পথসভা করে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। কমরেড পট্টনায়ক বলেন, করোনা পরিস্থিতিকে অজুহাত করে সরকার ক্লাসরুম শিক্ষাপদ্ধতির বদলে অনলাইন শিক্ষাকাঠামোকে চালু করার চক্রান্ত করেছে। তার বিরুদ্ধে এআইডিএসও দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে এসেছে, সেই আন্দোলনকে প্রতিহত করতে রাজ্য সরকার এআইডিএসও কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলা-হামলা-হুমকি সহ সব রকম অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নামিয়ে এনেছে। ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকার ১৬ নভেম্বর থেকে কিছু নির্দিষ্ট ক্লাসের জন্য স্কুল কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত

ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। এটা ছাত্র আন্দোলনের জয়। ডিএসও-র দাবি, অবিলম্বে শিক্ষার সমস্ত স্তরের ফি প্রত্যাহার করে সকল ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনার সুযোগ দিতে হবে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সুস্পষ্ট পরিকল্পনার ঘোষণা করতে হবে এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ভেঙে পড়া পরিকাঠামো পুনরুদ্ধারে সরকারকে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এ দিন রাজ্যের সব জেলা সদর সহ গুরুত্বপূর্ণ শহর ও গঞ্জে মিছিল ও পথসভা হয়।

চাষ অলাভজনক, অর্ধেক কৃষক পরিবারই ঋণগ্রস্ত

ভারতে গণবিক্ষোভের ভরকেন্দ্র এখন কৃষক সমাজের মধ্যে। দিল্লির কৃষক আন্দোলন গত এক বছরে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছেছে যে রাষ্ট্র তার দমন পীড়নের বাহিনী দিয়ে আন্দোলনকে সামাল দিতে পারছে না। কারণ এর পেছনে আছে কোটি কোটি মানুষের সমর্থন। কেন এই আন্দোলন সকলেই জানেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আনা তিনটি কালা কৃষি আইন এবং জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী)-২০২১ অবশ্যই এই বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু হঠাৎ এই বিক্ষোভ ফেটে পড়ল বিষয়টা তো এমন নয়। ভারত জুড়ে কৃষক মন অসন্তোষের বারুদে ভরা না থাকলে এমন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। তা হলে কী সেই কারণ?

কারণটি সম্প্রতি তুলে ধরেছে এন এস এস ও-র সমীক্ষা। দেখিয়েছে, গোটা দেশের ৯ কোটি ৩০ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে অর্ধেকই ঋণগ্রস্ত। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটিও তাই। রাজ্যে ৬৬ লক্ষ ৯০ হাজার কৃষক পরিবারের ৫০ শতাংশ ঋণগ্রস্ত। কেন এত ঋণগ্রস্ততা? এর কারণ প্রধানত দুটো। এক, চাষের খরচ অত্যধিক বেড়েছে। সার বীজ কীটনাশক, সেচের জন্য ডিজেল বিদ্যুৎ সহ সব কৃষি উপকরণের দাম আকাশছোঁয়া। এগুলির উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। পুরোটাই দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তথাকথিত পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের শর্ত মেনে পুঁজিবাদী সরকারের ব্যাপক হারে ভর্তুকি ছাঁটাই বা তুলে দেওয়া।

দ্বিতীয় কারণটি হল, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, সরকারি ক্রয় ক্রমাগত কমে যাওয়া এবং তার সুযোগে ফড়ে পাইকার তথা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের খপ্পরে চাষির অভাবি বিক্রিতে বাধ্য হওয়া। ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়ার. অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা জানেন, ব্যাঙ্ক পুঁজিপতিদের ঋণ দিতে দরাজহস্ত, কিন্তু চাষির বেলায় নাকি তা ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে নানা শর্তের বাহানা চলে। চাষি তখন বাধ্য হয় মহাজনের থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে। সে সুদ কোথাও কোথাও প্রায় মোট ঋণের সমান হয়ে দাঁড়ায়। ঋণের এই জাল থেকে চাষি বেরোতে পারে না।

সমীক্ষা দেখিয়েছে, দেশে কৃষক পরিবারের গড় আয় মাসিক ১০,২১৮ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আয় আরও কম, যেহেতু এখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম। পশ্চিমবঙ্গে চাষি পরিবারের গড় আয় মাসে ৬,৭৬২ টাকা। এই আয়ের সামান্য অংশই আসে ফসল বেচে। অর্থাৎ চাষ থেকে আসে মাত্র ২২.৮ শতাংশ, অর্থাৎ ১৫৪২ টাকার মতো। বাকিটা আসে অন্যের জমিতে মজুরি, ১০০ দিনের কাজ, ঠ্যালা বা ভ্যান চালানো এবং ছোটখাটো ব্যবসা থেকে। ফলে চাষিকে বাধ্য হয়ে চাষে গুরুত্ব কমাতেই হচ্ছে, অন্য পেশায় যেতে হচ্ছে।

চাষকে অলাভজনক করে দেওয়া একটা মারাত্মক পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সরকার এবং বর্তমান বিজেপি সরকারের হাত ধরে কৃষির এই দুর্দশা হয়েছে। এখন মোদি সরকার ষড়যন্ত্র করছে কৃষিতে বৃহৎ কর্পোরেটদের ঢুকিয়ে ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে বিপণন সবটাই কুক্ষিগত করে তাদের বিপুল মুনাফার নয়া পথ করে দিতে। এতে শুধু কৃষক সর্বস্ব হারাবে তা নয়, অন্য সমস্ত পেশার সাধারণ মানুষও বিপন্ন হবেন। খাদ্যের বাজার হবে কল্পনাতীতভাবে দুর্মূল্য। কারণ, খাদ্যের বা ফসলের একমাত্র ক্রেতা হবে পুঁজিপতিরা। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন না থাকায় পুঁজিপতিরা ইচ্ছামতো খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে পারবে।

অনিবার্য কারণে 'মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব' লেখাটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

দু'বছরে ৩৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে নেমে এসেছে

করোনা অতিমারির আকস্মিক ধাক্কা এবং পুঁজিবাদী শোষণ বঞ্চনার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ভারতীয় মধ্যবিত্তের বড় অংশ দরিদ্রের স্তরে নেমে যাচ্ছে। এই বিপদ সঙ্কেত সম্প্রতি শোনা গেছে স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা সৌম্যকান্তি ঘোষের কথায়। এসবিআই কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটার তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি এ কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, তেলের দাম বাড়ার ফলে বিভিন্ন দরকারি পণ্য ও পরিষেবার খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছেন ক্রেতারা। মুদিখানার পণ্য থেকে শুরু করে চিকিৎসার ওষুধ পর্যন্ত সবই রয়েছে এই তালিকায়।

ডেবিট কার্ডে যাঁরা কেনাকাটা করেন বা যাতায়াতের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেন, এঁদের একটা স্থায়ী কাজ এবং মোটা বেতন আছে। সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে তারা কাজ করেন অথবা ভাল উপার্জনের ব্যবসা করেন। সমাজে এতদিন তাঁরা আর্থিক ভাবে সুরক্ষিত, এমনই ভাবা হত। কিন্তু করোনার জেরে লকডাউন ও তার বহু আগে থেকেই চলে আসা অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে এদেরও আর্থিক সুরক্ষা টাল খাচ্ছে। এদের অনেকেই কাজ হারিয়েছেন, অনেকের বেতন কমে গিয়েছে। এই অবস্থায় সব পণ্যের তীব্র মূল্যবৃদ্ধি সঙ্কটকে আরও পাকিয়ে তুলেছে। দেশের গরিব ও নিম্নবিত্ত মিলে জনসংখ্যার যে সিংহভাগ, তারা ইতিমধ্যেই সঙ্কটের তলদেশে নিমজ্জিত। এদের নিয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা খুব একটা আলোচনা করেন না। কিন্তু যাদের ক্রয়ক্ষমতাকে ভিত্তি করে তাঁরা বাজারের হিসেব করেন সেই মধ্যবিত্তের অবস্থাও এখন টলোমলো।

মধ্যবিত্ত কাদের বলা হয়? একটা হিসেবে মাথাপিছু দৈনিক ২২০ থেকে ৪৪০ টাকা খরচ করতে সক্ষম যারা তারাই মধ্যবিত্ত। গড়ে একটি পরিবারে সদস্য সংখ্যা চার ধরে হিসাব করলে যে পরিবারের মাসিক ব্যয় ২৬,৪০০ থেকে ৫২,৮০০ টাকা সেই পরিবারগুলি মধ্যবিত্ত পরিবার। ভারতে জনসংখ্যার কত অংশ উচ্চবিত্ত? মাত্র ০.২১ শতাংশ। উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কত? মোট ১২ কোটি অর্থাৎ জনসংখ্যার ৮.৭ শতাংশ।

মার্কিন গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চের সমীক্ষা ২০২০ সালে কোভিড অতিমারির প্রকোপে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ভারতীয় মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণিতে নেমে এসেছে। পিউ-র অনুমান ২০১৯ থেকে ২০২০-র মধ্যে চার কোটি ভারতীয় মধ্যবিত্ত কমে গিয়েছে। ১২ কোটির মধ্যে ৪ কোটি কমে যাওয়া মানে ৩৩ শতাংশ হ্রাস। অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের বাজার ৩৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী ৯৩ শতাংশ জনগণই ভারতে গরিব ও নিম্নবিত্ত যারা প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যটুকু কিনতে অপারগ। ফলে ভোগ্যপণ্য কেনায় তাদের কাটছাঁট করতে হচ্ছে। এই তথ্য ভারতীয় পুঁজিবাদের গভীর মন্দাকেই দেখিয়ে দেয়।

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন সম্মেলন

একের পাতার পর

প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতি প্রকাশ এন শাহ।

প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অনীশ কুমার রায়। মোদি সরকারের এই শিক্ষানীতির বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক দিকগুলি তুলে ধরে অ্যাকাডেমিক সেশনে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ইরফান হাবিব, অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার, ইউজিসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক সুকদেব থোরাট, প্রাক্তন উপাচার্য ও অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, আসাম ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, মহীশূর জেএসএস ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য এল জওহর নেশান, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শচীদানন্দ সিনহা, অধ্যাপক করুণানন্দন, অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার নায়ক সহ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। অ্যাকাডেমিক সেশনের প্রথম দিনের অধিবেশনের সঞ্চালক ছিলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর এবং দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সঞ্চালক ছিলেন আন্না ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এস থিলাগর।

প্রতিনিধি অধিবেশন সঞ্চালনা করেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবাশীষ রায় এবং মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন অন্ধ্রপ্রদেশ সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক এস

কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে অ্যাকাডেমিক সেশন

গোবিন্দরাজালু। সম্পাদকীয় রিপোর্টে অধ্যাপক অনীশ কুমার রায় শিক্ষার উপর শাসকশক্তির ধারাবাহিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সেভ এডুকেশন কমিটির দীর্ঘ আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেন।

বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা মূল প্রস্তাব ও সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট ভূ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় দেশজুড়ে শক্তিশালী 'সেভ এডুকেশন আন্দোলন' গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন কমিটির নাম প্রস্তাব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রকাশ এন শাহকে সভাপতি এবং অধ্যাপক অনীশ কুমার রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি নির্বাচিত হয়।

আন্দোলন করে দাবি আদায় করলেন আশাকর্মীরা

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২৯ অক্টোবর সারা রাজ্যে অবরোধ, প্রতীকী ফরম্যাট

ছবি ঃ মালদা। ডান দিকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর

পোড়ানো এবং জেলা সিএমওএইচ দপ্তরে ডেপুটেশন হয়েছে। এই কর্মসূচিতে রাজ্যে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার আশাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। ইউনিয়নের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তার মধ্যে শুধু হাসপাতালে দিশা ডিউটি বাতিল করেছে, বাকি দাবিগুলি কার্যকর করেনি। এই অবস্থায় আন্দোলন তীব্র করেছে ইউনিয়ন। এ দিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ইন্সেন্টিভের সব টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে, বুধবারের সরকারি ছুটির কোনও টাকা কাটা হবে না। মোবাইল রিচার্জ বাবদ ৩০০ টাকা এপ্রিল মাস থেকে দেওয়া হবে, জনসমীক্ষার জন্য টাকা দেওয়া হবে। গুরুতর কোনও কারণে অসুস্থ থাকলে তার ফিক্সড অনারিয়াম কাটা হবে না। চুড়িদার পরতে কোনও অর্ডার লাগবে না, সুতি কাপড় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। নার্সিংহোমে ডেলিভারি হলেও আশাকর্মীরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় সেটা দেখা হবে। রাতে যাতে হাসপাতালে যেতে না হয় তাও দেখা হবে। এই প্রতিশ্রুতিগুলি সবই দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল।

এ দিন মালদায় বিশাল সমাবেশ হয়। মালদার আশাকর্মী ভারতী পাল ঘোষকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আন্দোলনের চাপে ৭ মাস পর কর্তৃপক্ষ তাঁকে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়।

স্বাস্থ্যঅধিকর্তা ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে ২৩ নভেম্বর বৈঠক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১৫ দফা দাবিতে পঞ্চায়েত ট্যাক্স কালেক্টরদের ডেপুটেশন

সিপিএম শাসন থেকে তৃণমূল শাসন— পঞ্চায়েতের ট্যাক্স কালেক্টররা যে তিমিরে সেই

তিমিরেই। তীব্র মূল্যবৃদ্ধির এই বাজারেও তারা মাসে পান মাত্র ৭৫০ টাকা। পারিশ্রমিক ভাতা ও কমিশন মিলে এই টাকা বরাদ্দ। তাও অনিয়মিত থাকে বহু সময়। এঁদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন। মাসিক ১০ হাজার টাকা বেতন, ন্যূনতম পেনশন চালু, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা অনুদান, স্বাস্থ্যবিমায় অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারি কর্মীর মর্যাদার দাবিতে ২৬ অক্টোবর পঞ্চায়েত ডাইরেক্টরের কাছে দাবিপত্র পেশ করে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান থেকে পাঁচ শতাধিক কালেক্টর অংশগ্রহণ করেন। নেতৃত্ব দেন ইন্দুভূষণ গায়েন, রিঞ্জন ঘোষ, আমজাদ আলি চৌধুরী, প্রফুল্ল মণ্ডল। পঞ্চায়েত ডাইরেক্টর নিজ এক্তিয়ারভুক্ত দাবিগুলি কার্যকর করার আশ্বাস দেন।

সরকারি নীতির প্রতিবাদ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ইউনিয়নের

২০২০-র মার্চ থেকে প্রায় দেড় বছর সারা বাংলায় ৬০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না করা গরম খাবার পরিবেশন বন্ধ হয়ে আছে। এর ফলে প্রায় ৪০ লক্ষ মা ও শিশু পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর পরিবর্তে শুকনো চাল-ডাল ইত্যাদি রেশন (টিএইচআর) দেওয়া হলেও তা রান্না করা খাবারের পরিপূরক হয়নি। অপুষ্টি বৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ছে সর্বত্র। প্রথমত টিএইচআর হিসাবে যা দেওয়া হয়েছে তা বরাদ্দকৃত খাবারের তুলনায় কিছুই নয়। মাছ, ডিম, কলা এসব রেশনে দেওয়াই হয়নি। ফলে শিশুদের পুষ্টিতে চরম ঘাটতি হয়েছে।

এছাড়াও সমস্যা হল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে দেওয়া শিশু বা মায়ের রেশন দরিদ্র পরিবারগুলিতে শুধু মাত্র তাদের জন্য ব্যবহৃত হতে পারছে না। বহু পরিবার রোজগার হারিয়ে ওইটুকু খাবারকেও ভাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে দাবি তুলেছেন পুষ্টিকর খাবারের (এসএনপি) পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে, মা ও শিশুদের পুষ্টিতে কোপ বসানো চলবে না। তাঁরা রাজ্যের ব্লকে ব্লকে সিডিপিও, জেলাতে ডিপিও-র কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৮ অক্টোবর রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি ছিল, সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের অবসরকালীন ভাতা, মাসিক ২১ হাজার টাকা বেতন, সরকারি কর্মী হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে।

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কর

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের দাবি জানিয়ে কলকাতা জুড়ে চলছে প্রচার।

ছবি ঃ ঢাকুরিয়া কসবা বালিগঞ্জ এলাকার প্রচার। ১ নভেম্বর

পাঠকের মতামত

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ

বাংলাদেশে বর্তমান সাম্প্রদায়িক আক্রমণটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা নয়। এরকম পরিস্থিতিতে অনেকেই হতবিহ্বল। কারণ এর ব্যাপকতা। এর একটি দীর্ঘ যাত্রা রয়েছে। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অনুপস্থিতি এই পরিস্থিতি তৈরি করতে সহায়তা করেছে। জনগণের চেতনার মান সারশূন্য না করলে বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান থাকা সহজতর নয়। আমরা এমন এক ভঙ্গুর শাসনের অধীন। এখানে রাজনৈতিক ইস্তেহারের মূল্য কমে গেছে। আওয়ামি লিগের প্রধান প্রতিপক্ষ হল বিএনপি। আর বিএনপিকে সাইজ করতে গিয়ে বিএনপির রাজনীতির সাথে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মভিত্তিক দলগুলো ছিল তাদেরকে বিকাশিত করার সুযোগ করে দিয়েছে আওয়ামি লিগ। হেফাজতের প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলো বিএনপি জোটে অবস্থান করতো। এই খেলাটা এখন অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

আমি মনে করি, আমাদের টেক্সটবুক বোর্ডের সিলেবাসে কী থাকবে, না থাকবে, হেফাজতের এই দাবি যখন এই সরকার মেনে নিয়েছে সে দিন থেকেই আধুনিক বাংলাদেশের স্বপ্নটি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আপনারা দেখবেন পাড়া-মহল্লায় সরকারি দলের এমপিদের প্রধান অতিথি করে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করতে। তাতে ধর্মীয় আলোচনা হলে অসুবিধার কিছু ছিল না। প্রধান অতিথি উদ্বোধন করে চলে যাওয়ার পর— ওয়াজে নারী বিদ্বেষ, অপর ধর্মগুলো নিয়ে বিদ্বেষ ছিল বক্তব্যের প্রধান বিষয়। এরা সেই বক্তব্যগুলো ইউটিউবে ছড়িয়ে দেখেছে এর লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার। এই রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের একটি আলোচনার ভিউয়ার হয়ত হাতে গোনা। এই যে পার্থক্য এটা একটি পশ্চাৎপদতারই সূচক। এই ওয়াজ করতে করতেই তারা রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। শাসক দল বড় ধাক্কাটি খেয়েছে বুড়িগঙ্গা ব্রিজের মুখে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন করতে গিয়ে।

এরপর এই শক্তিটিকে তারা যেভাবে মোকাবেলার চেষ্টা করেছে তাও কিন্তু জোর খাটিয়ে। রাজনৈতিক-সামাজিক ভাবে এই যে পরাজয় এর পেছনে রয়েছে আওয়ামি লিগের ভোটারবিহীন নির্বাচন, তার সাথে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি এবং জনগণের বাক ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ। এভাবে ক্ষমতায় থাকলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়, তারাও বোধ হয় তা জানে। আসলে আমাদের দেশ সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া একটি দেশ। এখানে ধর্মের অপপ্রচার মোকাবিলা করে আমরা আমাদের দেশ স্বাধীন করেছি। উক্ত সময়ে ধর্মগোষ্ঠীগুলো পরাজিত হয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। দুঃখজনক হলেও এই সত্যটি আজ স্বীকার করতে হবে, আওয়ামি লিগের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার উগ্র ধর্মীয় রাজনীতি জায়গা করে নিয়েছে। বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে এমন এক ফাঁদ সে নিজেই রচনা করেছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য এ এক মরণফাঁদ। আমরা যদি বিষবাষ্প মুক্ত আধুনিক একটি দেশ পেতে চাই, তা হলে আওয়ামি লিগ-বিএনপির বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সে কেবলমাত্র বাম-গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের দ্বারাই সম্ভব। এই শক্তিটির বিকশিত হওয়া জরুরি। বিকশিত হলে আপনার আমার হতাশা তখনই কাটবে।

মহম্মদ হক আরিফ
ঢাকা

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি

একের পাতার পর

শুধু মার্কসবাদীর কাছে নয়, বিকাশের তত্ত্ব বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান আছে এরূপ যেকোনও শিক্ষিত ব্যক্তির কাছেও উত্তরণ পর্বের এইরূপ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত গোটা একটা ঐতিহাসিক যুগের অনিবার্য অস্তিত্ব প্রতীয়মান হতে বাধ্য। অথচ সমাজতন্ত্রে উত্তরণ নিয়ে যত আলোচনা পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বর্তমান প্রতিনিধিদের কাছ থেকে আমরা শুনি (এবং নিজেদের ঝুটা সোশ্যালিস্টতকমা সত্ত্বেও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত প্রতিনিধি, ম্যাকডোনাল্ড ও জাঁ লগে, কাউটস্কি ও ফ্রিডরিখ আডলার সমেত সকলেই তাই), — তার বৈশিষ্ট্যই হল এই স্বতঃস্পষ্ট সত্যের সম্পূর্ণ বিস্মরণ। পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের বৈশিষ্ট্যই হল শ্রেণি সংগ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণা, শ্রেণিসংগ্রামকে পাশ কাটিয়ে যাবার স্বপ্ন, তীক্ষ্ম বাঁকগুলিকে মোলায়েম ও ভোঁতা করে দেওয়ার ঝোঁক। সেইজন্যই এ ধরনের গণতন্ত্রীরা হয় পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের গোটা ঐতিহাসিক পর্বটা স্বীকার করার প্রয়োজনই বোধ করে না, নয়ত দুই যুযুধান শক্তির মধ্যে একটির পক্ষ নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনার বদলে উভয় শক্তির মধ্যে মিটমাট ঘটাবার ভুয়া পরিকল্পনা তৈরিকেই নিজেদের কর্তব্য জ্ঞান করে।

(২)

আমাদের দেশের বিরাট পশ্চাৎপদতা ও পেটি বুর্জোয়া প্রকৃতির জন্য রাশিয়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অগ্রণী দেশগুলির তুলনায় অনিবার্যভাবেই কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে পৃথক হবেই। কিন্তু মূল শক্তিগুলি— এবং সামাজিক অর্থনীতির মূল রূপগুলি— যে কোনও পুঁজিবাদী দেশের মতোই হবে রাশিয়াতেও। সেজন্য রাশিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আর যাই হোক সর্বপ্রধান ক্ষেত্রগুলিতে দেখা দেয় না।

সমাজ অর্থনীতির এই মূল রূপগুলি হল ঃ পুঁজিবাদ, ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন, কমিউনিজম। এই মূল শক্তিগুলি হল ঃ বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া (বিশেষত কৃষক-সম্প্রদায়) ও প্রলেতারিয়েত।

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে রাশিয়ার অর্থনীতি হল বৃহৎ এক রাষ্ট্রের অখণ্ড আয়তনে কমিউনিস্ট নীতিতে সম্মিলিত, শ্রমের প্রথম পদক্ষেপগুলির সঙ্গে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন ও টিকে থাকা পুঁজিবাদ এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনকে ভিত্তি করে যে নতুন পুঁজিবাদের উদয় হচ্ছে— তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

রাশিয়ায় শ্রম সেই পরিমাণে কমিউনিস্ট নীতিতে সম্মিলিত হয়েছে যে পরিমাণে, প্রথমত, উৎপাদন-উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ ঘটেছে এবং, দ্বিতীয়ত, যে পরিমাণে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমিতে ও রাষ্ট্রীয় শিল্পসংস্থাগুলিতে বৃহৎ উৎপাদন সংগঠিত করছে, অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা ও সংস্থার মধ্যে শ্রমশক্তির বণ্টন করছে, শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিপুল পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য বণ্টন করছে।

রাশিয়ায় কমিউনিজমের প্রথম পদক্ষেপগুলির কথা আমরা বলছি (১৯১৯ সালের মার্চে গৃহীত আমাদের পার্টি কর্মসূচিতেও তাই বলা হয়েছে), কেননা এই সব শর্ত আমাদের এখানে কেবল অংশত রূপায়িত, কিংবা অন্য কথায়, এই সব শর্তের রূপায়ণ রয়েছে কেবল তার প্রাথমিক স্তরে। আমরা এক বৈপ্লবিক ধাক্কায় সেটা করতে পেরেছি যা এভাবে করা সম্ভব ঃ যেমন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রথম দিনেই ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর (৮ নভেম্বর, ১৯১৭) জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত হয়েছে বৃহৎ মালিকদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে, উচ্ছেদ হয়েছে বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বৃহৎ পুঁজিপতি, কলকারখানা, জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, রেলপথ ইত্যাদির মালিকদেরও উচ্ছেদ করা হয়েছে বিনা ক্ষতিপূরণেই। শিল্পে বৃহৎ উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় সংগঠন, কলকারখানা, রেলপথের উপর 'শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ' থেকে 'শ্রমিক পরিচালনায়' উত্তরণ— এটা মূলত ও প্রধানত ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে তা সবে শুরু হয়েছে ('সোভিয়েত খামার', রাষ্ট্রীয় জমিতে শ্রমিক রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত বৃহৎ খামার)। একই ভাবে সবে শুরু হয়েছে ক্ষুদ্র পণ্য কৃষি থেকে কমিউনিস্ট কৃষিতে উত্তরণ হিসাবে ক্ষুদ্র কৃষকদের নানা ধরনের সমিতি গঠন। ব্যক্তিগত ব্যবসার বদলে দ্রব্য বণ্টনের রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, অর্থাৎ, শহরের জন্য শস্যের এবং গ্রামের জন্য শিল্পদ্রব্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ ও সরবরাহ। কৃষক অর্থনীতি রূপে ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি পুঁজিবাদের অসাধারণ ব্যাপক ও অসাধারণ দৃঢ়মূল ভিত্তি। এই ভিত্তিতে পুঁজিবাদ টিকে থাকে ও পুনরুদিত হয় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নির্মমতম সংগ্রামে। এ সংগ্রামের রূপ হল, রাষ্ট্রীয় শস্য সংগ্রহের বিরুদ্ধে (তথা অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহেরও বিরুদ্ধে)— সাধারণভাবে দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বণ্টনের বিরুদ্ধে ফড়িয়াবৃত্তি ও কালোবাজারি।

(৩)

এই সমস্ত বিমূর্ত তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য বোঝাবার জন্য প্রত্যক্ষ তথ্য দেব। কমপ্রদ-এর (খাদ্য জনকমিশারিয়েত) তথ্য অনুসারে রাশিয়ায় শস্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহে ১৯১৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯১৮ সালের ১ আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৩ কোটি পুদ (১ পুদ = ১৬ কেজির একটু বেশি)। পরের বছর প্রায় ১১ কোটি পুদ। পরের বছর (১৯১৯-১৯২০) প্রথম তিন মাসের শস্য সংগ্রহ অভিযান থেকে বোঝা যাচ্ছে, পাওয়া যাবে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পুদ, যেখানে ১৯১৮ সালের ওই ক'মাসে (আগস্ট-অক্টোবর) মিলেছিল ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পুদ।

পুঁজিবাদের উপর কমিউনিজমের বিজয়ের অর্থে এই সংখ্যাগুলি আমাদের কাজের মন্থর কিন্তু অটল উন্নয়নের পরিষ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিশ্বের পরাক্রান্ত রাষ্ট্রগুলির সর্বশক্তি প্রয়োগ করে রুশী ও বিদেশি পুঁজিপতিরা যে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তার ফলে বিশ্বে অশ্রুতপূর্ব যে বাধা ও সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে তা সত্ত্বেও এ উন্নতিটা ঘটেছে।

তাই সর্ব দেশের বুর্জোয়া এবং তার প্রকাশ্য ও গোপন দালালেরা (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্কা সমাজতন্ত্রীরা) যতই মিথ্যা ও নিন্দা রটাক, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ঃ প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মূল অর্থনৈতিক প্রশ্নের দিক থেকে আমাদের এখানে পুঁজিবাদের উপর কমিউনিজমের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। সারা বিশ্বের বুর্জোয়ারা বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হচ্ছে ও ফুঁসছে, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির আয়োজন করছে ঠিক এই কারণে যে, যুদ্ধের জোরে আমাদের দমন না করতে পারলে সমাজ অর্থনীতির পুনর্নির্মাণে আমাদের বিজয় যে অনিবার্য সেটা তারা চমৎকার বুঝেছে। কিন্তু এই উপায়ে আমাদের দমন করার চেষ্টায় তারা সফল হচ্ছে না।

আমরা যে সংক্ষিপ্ত সময় পেয়েছিলাম এবং বিশ্বে অশ্রুতপূর্ব যে দুরূহতার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল, তার ভেতরেই পুঁজিবাদের উপর ঠিক কতটা জয় আমরা অর্জন করেছি তা দেখা যাবে নিচের পরিণাম সংখ্যাগুলি থেকে। গোটা সোভিয়েত রাশিয়া নয়, তার ২৬টি গুবের্নিয়া নিয়ে শস্যের উৎপাদন ও ভোগের তথ্য কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর সবে প্রস্তুত করে দিয়েছে প্রকাশের জন্য।

(এখানে লেনিন একটি সারণী দিয়েছিলেন, তার সবকিছু আলাদা করে তাঁর লেখার মধ্যেই থাকায় সারণীটি দেওয়া হল না)

অর্থাৎ, শহরগুলিকে অর্ধেক শস্য জোগাচ্ছে কমপ্রদ, অর্ধেক জোগাচ্ছে ফড়িয়ারা। ১৯১৮ সালে শহরের শ্রমিকদের খাদ্য বিষয়ে নিখুঁত অনুসন্ধান করে ঠিক এই অনুপাত পাওয়া গেছে। তদুপরি, রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া শস্যের জন্য শ্রমিকেরা যে টাকা খরচ করে সেটা ফড়িয়াদের তুলনায় ৯ গুণ কম। কালোবাজারি শস্যের দর রাষ্ট্রীয় দরের চেয়ে দশগুণ বেশি। শ্রমিক বাজেটের নিখুঁত অধ্যয়ন থেকে এটি পাওয়া যায়।

(৪)

উদ্ধৃত তথ্যগুলি নিয়ে ভালো করে চিন্তা করলে রাশিয়ার বর্তমান অর্থনীতির সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মতো নিখুঁত ছবি পাওয়া যাবে।

চিরাচরিত উৎপীড়ক ও শোষক, জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে শ্রমজীবীদের মুক্ত করা হয়েছে। সত্যিকারের মুক্তি ও সত্যিকারের সাম্যের দিকে এই যে পদক্ষেপ— আয়তনে, পরিমাণে ও দ্রুততায় যা বিশ্বে অভূতপূর্ব, সে পদক্ষেপটা হিসাবে ধরে না বুর্জোয়াদের সেই সমর্থকরা (সেই সঙ্গে পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীরাও), যারা স্বাধীনতা ও সাম্য বলতে পার্লামেন্টী বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বোঝায়, আর মিথ্যা করে তাকে অভিহিত করে সাধারণভাবে 'গণতন্ত্র' বা 'বিশুদ্ধ গণতন্ত্র' (কাউটস্কি) রূপে।

কিন্তু ঠিক সত্যিকারের সাম্য, সত্যিকারের মুক্তি কী, (জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তি) শ্রমজীবীরা তা বোঝে, তাই অমন দৃঢ়ভাবে তারা সোভিয়েত শাসনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়ার মতো কৃষিপ্রধান দেশে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব থেকে সর্বাগ্রে লাভ হয়েছে, সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হয়েছে সাধারণভাবে কৃষকদের। জমিদার ও পুঁজিপতিদের আমলে রাশিয়ায় কৃষকরা অনাহারে থাকত। আমাদের ইতিহাসের সুদীর্ঘ শতক জুড়ে কৃষকেরা এর আগে নিজেদের জন্য মেহনত করার সুযোগ পায়নি কখনও ঃ কোটি কোটি পুদ শস্য

সাতের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁচবেড়িয়া গ্রামের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উত্তর কাঁথি লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড বলাই মণ্ডল ৮ অক্টোবর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

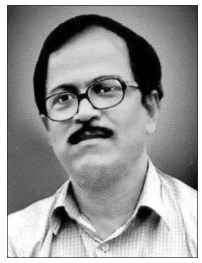

১৯৭৪ সালে কাঁথি থানার ভাজাচাউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিহরা হাইস্কুলের ছাত্র কমরেড বলাই মণ্ডল দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। কঠোর দারিদ্রের কারণে মাধ্যমিক পাশ করার পর মারিশদা থানার অন্তর্গত নাচিন্দা এলাকায় এসে গৃহশিক্ষকতা করার সাথে দলের কাজ করতে থাকেন। দলের আদর্শের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, এলাকার মানুষের মধ্যে দলের চিন্তাধারা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, এলাকায় নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজের উদ্যোগের ফলে এলাকার মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। মিষ্টভাষী, দরদি মন এবং অসহায়দের প্রতি মমত্ববোধ তাকে খুব জনপ্রিয় করে তোলে। তাঁর সাহচর্যে এলাকার কয়েকজন ছাত্র-যুবক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৮৩ সালের বাসভাড়া বিরোধী আন্দোলন ও এলাকার নানা গণআন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সুন্দর দেওয়াল লিখন ও ছবি আঁকার দক্ষতার প্রতি এলাকার মানুষের প্রবল আকর্ষণ ছিল। দলের বড় বড় কর্মসূচিতে অবিভক্ত মেদিনীপুরের নানা জায়গায় দেওয়াল লিখতে নেতৃত্বের নির্দেশে চলে যেতেন নির্দ্বিধায়।

স্ত্রী ও দুই কন্যাকে দলের সাথে যুক্ত করার তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। সন্তানেরা দলের কাজ করছে বলে তাঁর গভীর তৃপ্তি ছিল। ২০২০ সালে এলাকায় মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। অসুস্থ অবস্থায় সমাজবিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের নেতা-কর্মীরা এবং এলাকার বিভিন্ন স্তরের কয়েকশো মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। তাঁর মত্যুতে দল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, সংবেদনশীল ও উন্নত মনের একনিষ্ঠ সংগঠককে হারাল।

কমরেড বলাই মণ্ডল লাল সেলাম

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি

ছয়ের পাতার পর

পুঁজিপতিদের দিয়ে, শহরে পাঠিয়ে, বিদেশে পাঠিয়ে তারা না খেয়ে থেকেছে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বেই কৃষকেরা প্রথম নিজের জন্য খাটল, শহরবাসীদের চেয়ে ভালো খেয়ে থাকল। এই প্রথম কার্যক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্বাদ পেল কৃষকরা ঃ নিজেদের রুটি খাবার স্বাধীনতা, বুভুক্ষা থেকে স্বাধীনতা। জমির বিলিবণ্টনে সাম্য কায়েম করা হল। সবাই জানে, সর্বোচ্চ মাত্রায় বিপুল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকেরা জমি বাটোয়ারা করছে 'পেট গুনতি করে'।

সমাজতন্ত্রর অর্থ হল শ্রেণির বিলোপ।

শ্রেণির বিলোপ করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার জমিদার ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ। কর্তব্যের এই অংশটা আমরা পূরণ করেছি, কিন্তু এটা হল অংশমাত্র, এবং সেটা সবচেয়ে দুরূহও নয়। শ্রেণির বিলোপের জন্য, দ্বিতীয়ত, দরকার কারখানা-শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপ, সবাইকেই শ্রমিক করে তোলা। সেটা এক ধাক্কায় করা সম্ভব নয়। এ হল অত্যন্ত দুরূহ ও অনিবার্য ভাবেই দীর্ঘকালীন একটা কর্তব্য। কোনও রকম একটা শ্রেণির উচ্ছেদ করে এ কাজ করা সম্ভব নয়। তার সমাধান সম্ভব কেবল সমস্ত সামাজিক অর্থনীতির সাংগঠনিক পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে, একক, বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র পণ্য অর্থনীতি থেকে সামাজিক বৃহদায়তন অর্থনীতিতে উত্তরণ দ্বারা। এরূপ উত্তরণ অনিবার্যরূপেই দীর্ঘকালীন। অধৈর্য হয়ে অসতর্ক প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক পদক্ষেপ নিলে সে উত্তরণ কেবল বিলম্বিত ও দুরূহই হবে। এ উত্তরণ ত্বরান্বিত করা যায় কৃষকদের কেবল এমন সাহায্য দিয়ে যার কল্যাণে বিপুল মাত্রায় সমস্ত কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন ও তার আমূল পুনর্গঠন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

কর্তব্যের দ্বিতীয়, দুরূহতম অংশটার সমাধান করতে হলে বুর্জোয়ার উপর বিজয়ী প্রলেতারিয়েতকে কৃষক-সম্প্রদায় প্রসঙ্গে তার রাজনীতির মূলধারা অটলভাবে অনুসরণ করতে হবে ঃ মালিক কৃষক থেকে মেহনতী কৃষকদের, ব্যাপারী কৃষক থেকে শ্রমজীবী কৃষকদের, কালোবাজারী-কৃষক থেকে খাটিয়ে- কৃষকদের তফাৎ করতে হবে, সীমারেখা টানতে হবে।

এই সীমারেখার মধ্যেই সমাজতন্ত্রের সমস্ত মর্মার্থ নিহিত।

এবং অবাক হবার কিছু নেই যে মুখে সমাজতন্ত্রী ও কাজে পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মার্তভ ও চের্নোভরা, কাউটস্কি অ্যাণ্ড কোং) সমাজতন্ত্রের এই মর্মার্থ বোঝেন না।

উল্লিখিত এই সীমারেখা টানা অতি দুরূহ, কেননা জীবন্ত বাস্তবে 'কৃষকদের' সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যত বিভিন্নতাই থাক, যত বৈপরীত্যই থাক, তা সবই এক সমগ্রে নিহিত। তাহলেও সীমারেখা টানা সম্ভব এবং শুধু সম্ভবই নয় বরং কৃষক অর্থনীতি ও কৃষক জীবনযাত্রার পরিস্থিতি থেকেই তা অনিবার্যরূপে বেরিয়ে আসে। যুগের পর যুগ মেহনতী কৃষকদের পীড়ন করেছে জমিদার, পুঁজিপতি, ব্যাপারী, কালোবাজারি ও তাদের রাষ্ট্র, সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রও তার অন্তর্গত। যুগের পর যুগ ধরে মেহনতী কৃষকেরা এইসব পীড়ক ও শোষকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এসেছে এবং জীবন থেকে পাওয়া এই 'শিক্ষায়' কৃষকেরা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে, ব্যাপারীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে ঐক্য সন্ধানে বাধ্য হচ্ছে। অথচ সেই সঙ্গেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলে, পণ্য অর্থনীতির পরিস্থিতির ফলে অনিবার্যভাবেই কৃষকেরা (সর্ব ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু অতি প্রচুর পরিমাণ ক্ষেত্রেই) পরিণত হচ্ছে ফড়িয়া ও কালোবাজারিতে।

আমাদের উপরে-উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে মেহনতী কৃষক ও কালোবাজারি কৃষকের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার যে সব ত্রুটি সম্পর্কে শ্রমিক সরকার ভালোই সচেতন, কিন্তু সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম পর্বে যা দূর করা সম্ভব নয়, সে সব ত্রুটি সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির হাতে এই যে কৃষক ১৯১৮-১৯১৯ সালে শহরের ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের জন্য বাঁধা রাষ্ট্রীয় দরে ৪ কোটি পুদ শস্য দিয়েছিল — এই কৃষক হল শ্রমজীবী কৃষক, সোশ্যালিস্ট-শ্রমিকের সমান ও তার সতীর্থ, তার সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী, পুঁজির জোয়ালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক সহোদর ভাই। আর ওই যে কৃষক শহরের শ্রমিকদের টানাটানি ও বুভুক্ষার সুযোগ নিয়ে, রাষ্ট্রকে ফাঁকি দিয়ে, সর্বত্র প্রতারণা, লুণ্ঠন, জালজুয়াচুরি বাড়িয়ে তুলে ও তার পুনর্জন্ম দিয়ে গোপনে গোপনে ৪ কোটি পুদ শস্য বিক্রি করেছে রাষ্ট্রীয় দরের দশগুণও বেশি দরে, এই কৃষক হল কালোবাজারি, পুঁজিপতিদের সহযোগী, এ হল শ্রমিকদের শ্রেণিশত্রু, এ হল শোষক। কেননা উদ্বৃত্ত শস্য হাতে থাকা, যা আহরিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি থেকে এবং এমন কৃষি-যন্ত্রের সাহায্যে যার সৃষ্টিতে কোনও না কোনও ভাবে শুধু কৃষক নয়, শ্রমিক এবং অন্যান্যদের শ্রমও ঢালা হয়েছে, এই উদ্বৃত্ত শস্য রাখা ও তা নিয়ে কালোবাজারি করার অর্থ ক্ষুধার্ত শ্রমিকের শোষণকারী হয়ে যাওয়া।

আমাদের সংবিধানে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে অসাম্য, সংবিধান সভার ভাঙন, উদ্বৃত্ত শস্যের জবরদস্তি আদায় প্রভৃতির দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাদের চারিদিক থেকে উচ্চস্বরে অভিযোগ তুলে বলা হয়, তোমরা স্বাধীনতা, সমতা ও গণতন্ত্র লঙ্ঘন করছো। আমরা জবাব দিই ঃ মেহনতি কৃষকরা যুগের পর যুগ যাতে জর্জরিত হয়েছে সেই বাস্তব অসাম্য, সেই বাস্তব স্বাধীনতাহীনতা বিলোপ করার জন্য আমাদের মতো এতখানি করেছে এমন রাষ্ট্র দুনিয়ায় নেই। কিন্তু কালোবাজারি কৃষকের সঙ্গে সমতা আমরা কখনও মানি না, যেমন মানি না শোষকের সঙ্গে শোষিতের, ভুরিভোজীর সঙ্গে অনাহারীর 'সমতা', দ্বিতীয়কে লুঠ করার জন্য প্রথমের 'স্বাধীনতা'। এবং যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি এই পার্থক্যটা বুঝতে চান না, তাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, আন্তর্জাতিকতাবাদী, কাউটস্কি, চের্নোভ, মার্তভ বলে অভিহিত করলেও তাঁদের আমরা শ্বেতরক্ষী বলেই দেখব।

(৫)

সমাজতন্ত্রের অর্থ হল শ্রেণির বিলোপ। এই বিলোপের জন্য প্রলেতারীয় একনায়কত্ব যথাসাধ্য করেছে। কিন্তু এক ধাক্কায় শ্রেণির বিলোপ সম্ভব নয়। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগ ধরে শ্রেণি আছে ও থাকবে। শ্রেণিগুলি যখন লোপ পাবে, তখন একনায়কত্বের প্রয়োজন থাকবে না। শ্রেণি লোপ পাবে না প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ছাড়া। শ্রেণি থেকে গেছে, কিন্তু প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে প্রত্যেক শ্রেণিরই রূপান্তর ঘটেছে, বদলেছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্রলেতারীর একনায়কত্বের আমলে শ্রেণি-সংগ্রাম লোপ পায় না, অন্য রূপ পরিগ্রহ করে মাত্র।

পুঁজিবাদে প্রলেতারিয়েত ছিল নিপীড়িত শ্রেণী, উৎপাদন-উপায়ের উপর সর্ববিধ মালিকানা-বর্জিত শ্রেণি, এমন একমাত্র শ্রেণি যে সরাসরি ও সমগ্রভাবে ছিল বুর্জোয়ার বিপরীতে এবং তাই একমাত্র সেই শেষপর্যন্ত বিপ্লবী হবার ক্ষমতা ধরেছিল। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে প্রলেতারিয়েত হয়ে দাঁড়াল শাসক শ্রেণি ঃ স্বহস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধরে রেখেছে সে, ইতিমধ্যেই সমাজীকৃত উৎপাদন-উপায়ের ব্যবস্থাপনা করছে, দোদুল্যমান, অন্তর্বর্তী অংশ ও শ্রেণিগুলিকে সে চালাচ্ছে, শোষকদের প্রতিরোধের বর্ধিত উদ্যোগকে সে দমন করছে। এ সবই হল শ্রেণি-সংগ্রামের বিশেষ কর্তব্য— এমন কর্তব্য যা প্রলেতারিয়েত আগে হাজির করেনি ও করতে পারত না।

শোষকদের, জমিদার ও পুঁজিপতিদের শ্রেণি অন্তর্হিত হয়নি এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বে সঙ্গে সঙ্গেই তা অন্তর্ধান করতে পারে না। শোষকেরা পরাজিত কিন্তু বিলুপ্ত নয়। তারা এখন বিশ্বপুঁজির অংশ ও শাখা হিসাবে পুঁজিবাদের একটা আন্তর্জাতিক ঘাঁটি। কিছু কিছু উৎপাদন-উপায়ের অংশবিশেষ তাদের হাতে রয়ে গেছে, রয়েছে টাকা, রয়েছে বিপুল সামাজিক সম্পর্ক। তাদের এই পরাজয়ের ফলেই তাদের প্রতিরোধের উদ্যোগ বেড়েছে শত গুণ, সহস্র গুণ বেশি। রাষ্ট্রিক, সামরিক, অর্থনৈতিক পরিচালনা 'বিদ্যায়' তারা অনেক বেশি পারদর্শী। ফলে সংখ্যায় তারা মোট জনগণের যেটুকু অংশ তার চেয়ে তাদের গুরুত্ব অতুলনীয় রকমের বেশি। শোষিতদের বিজয়ী অগ্রবাহিনীর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে ক্ষমতাচ্যুত শোষকদের শ্রেণি-সংগ্রাম হয়ে উঠেছে অপরিসীম রকমের বেশি তীক্ষ্ণ ও তীব্র। যদি বিপ্লবের কথা বলতে হয়, যদি সংস্কারবাদী মোহ দিয়ে তার অর্থ বদলে দেওয়া না হয় (যা করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত বীরেরা), তাহলে এর অন্যথা হতে পারে না।

শেষতঃ, সাধারণভাবে সমস্ত পেটি বুর্জোয়ার মতোই কৃষক-সম্প্রদায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আমলেও একটা মাঝামাঝি,অন্তর্বর্তী অবস্থায় থাকে ঃ একদিকে এরা হল মেহনতীদের একটা বেশ বড়ো (এবং পশ্চাৎপদ রাশিয়ায় বিপুল) অংশ, যারা জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণ স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ, অন্যদিকে এরা হল বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র উৎপাদক, সম্পত্তিমালিক ও ব্যাপারী। এরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তারা অনিবার্যভাবেই প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে। এবং এই শেষোক্ত দুইয়ের মধ্যে সংগ্রামের ফলে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের অবিশ্বাস্য রকমের প্রচণ্ড ভাঙনের ফলে, পুরাতনের প্রতি, রুটিনের প্রতি, অপরিবর্তনীয়তার প্রতি ঠিক এই কৃষক ও সাধারণভাবে পেটি বুর্জোয়াদের অত্যধিক আসক্তির ফলে এ তো স্বাভাবিক যে এদের ক্ষেত্রে একপক্ষ থেকে অন্যপক্ষে গমন, দোলায়মানতা, ডিগবাজি, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি আমরা দেখতেই থাকব।

এই শ্রেণি বা এই সব সামাজিক অংশগুলির ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য হল তাদের পরিচালনা করা, তাদের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। দোদুল্যমান ও অস্থিরমতিদের নিজেদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া— এই হল প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য।

যদি আমরা সমস্ত মূল শক্তি বা শ্রেণির এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ফলে তাদের পরিবর্তিত পরস্পর সম্পর্কের তুলনা করি, তাহলে দেখব, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত প্রতিনিধিদের সাধারণভাবে 'গণতন্ত্রের মাধ্যমে' সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রচলিত পেটি বুর্জোয়া ধারণাটা কী অপরিসীম একটা তাত্ত্বিক গাঁজাখুরি, কী চরম নির্বুদ্ধিতা। এই ভ্রান্তির ভিত্তি হল গণতন্ত্র সম্পর্কে বুর্জোয়াদের কাছ থেকে পাওয়া এই কুসংস্কার যে গণতন্ত্র হচ্ছে শর্তহীন বা শাশ্বত এবং শ্রেণিবহির্ভূত একটি ধারণা। আসলে প্রলেতারীয় একনায়কত্বে গণতন্ত্রও উত্তীর্ণ হয় একেবারেই নতুন একটা পর্যায়ে এবং সমস্ত ও সর্ববিধ রূপকে স্বীয় অধীনে এনে শ্রেণি-সংগ্রামও উঠে যায় উচ্চতর একটা স্তরে। ।

স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্রের সাধারণ কথাগুলি আসলে পণ্য উৎপাদনী সম্পর্কের ছাঁচে-ঢালা একটা ধারণার অন্ধ পুনরাবৃত্তির সমতুল্য। এই সব সাধারণ বুলির সাহায্যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রত্যক্ষ কর্তব্য সম্পাদন করতে যাওয়ার অর্থ সম্পূর্ণত বুর্জোয়ার তাত্ত্বিক এবং নৈতিক অবস্থানে চলে আসা। প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্নটা দাঁড়ায় শুধু এই ঃ কোন শ্রেণির নিপীড়ন থেকে মুক্তি? কোন শ্রেণির সঙ্গে কোন শ্রেণির সাম্য? গণতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে, নাকি ব্যক্তিগত মালিকানা লোপের জন্য সংগ্রামের বনিয়াদে? ইত্যাদি।

'অ্যান্টি-ডুরিং' গ্রন্থে এঙ্গেলস বহু আগেই বলে গেছেন যে শ্রেণি বিলোপের অর্থে সাম্য না বুঝলে পণ্য-উৎপাদনী সম্পর্কের ছাঁচে-ঢালা চিন্তায় সাম্যের বোধটা পরিণত হয় একটা কুসংস্কারে। সাম্যের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বোধের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বোধের পার্থক্যের এই প্রাথমিক সত্যটা ক্রমাগত ভুলে যাওয়া হচ্ছে। আর এ সত্য যদি না ভোলা হয়, তাহলে এ কথা স্বতঃস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বুর্জোয়াকে উচ্ছেদকারী প্রলেতারিয়েত এর দ্বারা শ্রেণি বিলোপের দিকেই সবচেয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করছে, এবং তা সমাপনের জন্য প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণি-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে রাষ্ট্রক্ষমতার যন্ত্রকে ব্যবহার করে এবং ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়া ও দোদুল্যমান পেটি বুর্জোয়া প্রসঙ্গে সংগ্রাম, প্রভাব-বিস্তার ও চাপের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে। (অসম্পূর্ণ লেখা) ৩০ ১০ ১৯১৯

'প্রাভদা', ২৫০ সংখ্যা ৭ নভেম্বর, ১৯১৯

ভ. ই. লেনিন, 'সংগৃহীত রচনাবলি', ৫ম রুশ সংস্করণের বয়ান অনুসারে, ৩৯ খণ্ড, ২৭১-২৮২ পৃঃ

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মালদায় আদিবাসী শিক্ষকের হেনস্থা

আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

হবিবপুর ব্লকের মানিকোড়া হাইস্কুলের শারীরশিক্ষার শিক্ষক তথা মালদা জেলার ক্রীড়াজগতে পরিচিত ব্যক্তিত্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একজন শিক্ষকের ওপর ১৭ অক্টোবর চোর অপবাদ দিয়ে তৃণমূলের ইংরেজবাজার পৌরসভার বিদায়ী কাউন্সিলর পরিতোষ চৌধুরী ও তার সাগরেদরা নির্মম অত্যাচার করে। পোষা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তাঁকে রাস্তায় ফেলে রাখে। উক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ওই শিক্ষকের বাবা এফআইআর করলেও পুলিশ প্রশাসন তাকে আড়াল করে রাখে। শেষে আদিবাসী সমাজ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের প্রবল ক্ষোভ আঁচ করে দু'জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। পরিতোষ চৌধুরীর গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং প্রশাসনের অমানবিকতার বিরুদ্ধে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে ২২ অক্টোবর ৩৪ নং জাতীয় সড়কের রথবাড়ি মোড়ে আদিবাসী সংগঠনগুলির ডাকে এক বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দাবিগুলির প্রতি সংহতি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) এই আন্দোলনে যোগ দেয়।

এআইডিওয়াইও-র দিল্লি রাজ্য সম্মেলন

দিল্লির ময়ূর বিহারে ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল এআইডিওয়াইও-র পঞ্চম দিল্লি রাজ্য সম্মেলন। ভয়াবহ ভাবে বাড়তে থাকা বেকার সমস্যা, অশ্লীলতা, সাম্প্রদায়িকতা ও নেশাদ্রব্যের প্রসারের বিরুদ্ধে এই সম্মেলনে দিল্লি শহর ও আশপাশের এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহসভাপতি জুবের রব্বানি। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড প্রভাস কুমার। অন্যান্য গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি অধিবেশনে যুবসমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা ও সেগুলির বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশের পর বিদায়ী সম্পাদক কমরেড অমরজিত কুমার নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। কমরেড মৌসম কুমারীকে সম্পাদক করে ১৪ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়।

শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এআইডিওয়াইও-র ধরনা। ২১ অক্টোবর

'কর্মবন্ধু'দের গ্রুপ ডি কর্মচারীর স্বীকৃতির দাবি

হাওড়া জেলার ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের অধীন আরআই অফিসে গ্রুপ ডি কর্মচারী না থাকায় ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার বা 'কর্মবন্ধু'রা সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নানা ধরনের কাজ করতে বাধ্য হন। অথচ তাদের বেতন মাসিক মাত্র ৩০০০ টাকা। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে হাওড়া জেলার (ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার) 'কর্মবন্ধু'রা ৮ অক্টোবর উলুবেড়িয়া এসডিএলআরও-র কাছে ডেপুটেশন দেন। এই অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ডিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করে গ্রুপ ডি কর্মচারী হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করবেন বলে আশ্বাস দেন।

এআইডিএসও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা কেন্দ্রীয় অফিসে শতাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক আলোচনা সভা। ২৪ অক্টোবর

এআইকেকেএমএস-এর ডাকে কিসান জাঠা

হলদিবাড়ি। কোচবিহার

তিনটি কৃষি আইন বাতিল ও বিদ্যুৎ আইন ২০২০ বাতিল সহ কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইনসঙ্গত করার দাবিতে ২৬ অক্টোবর কিসান জাঠা মিছিল সংগঠিত করল অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন। সারা দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যের জেলায় জেলায় জাঠা মিছিল সংগঠিত হয়। ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত কিসান সংগ্রাম সপ্তাহের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস। বিগত প্রায় এক বছর ধরে দিল্লির সিংঘু বর্ডারে দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে আসছে কৃষকরা।

এদিন কেশিয়াড়ী ব্লকের কানপুর এলাকা থেকে বাইক জাঠা মিছিল শুরু হয়। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুরে কৃষকদের গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদও জানানো হয় এ দিন। পাশাপাশি পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানানো হয়।

ফালাকাটা। আলিপুরদুয়ার

হিঙ্গলগঞ্জ থেকে বসিরহাট টাউন হল। উত্তর ২৪ পরগণা

লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে বিক্ষোভ

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সমস্ত লাইনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দ্রুত সমস্ত লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে ২৫ অক্টোবর খড়গপুর ডিআরএম-এ বিক্ষোভ দেখানো হয়। দাবিগুলি হল— সমস্ত স্টেশনে সাধারণ যাত্রীদের টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা, যতদিন না পর্যন্ত লোকাল ট্রেন চালু হচ্ছে, ততদিন শিয়ালদা এবং বর্ধমান লাইনের মতো স্পেশাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো এবং সমস্ত স্টেশনে সাধারণ যাত্রীদের টিকিট দেওয়া ও যাত্রী পরিষেবা চালু এবং মেদিনীপুর থেকে হাওড়াগামী স্পেশাল ট্রেনগুলি টিকিয়াপাড়াতে নয়, হাওড়া পর্যন্ত চালু করা। পাঁচ শতাধিক নাগরিক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক মধুসূদন বেরা, পশ্চিম মেদিনীপুরের নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য সুরঞ্জন মহাপাত্র, হাওড়ার নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক মিনতি সরকার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার সমিতির নেতা গোপাল মাইতি। কর্তৃপক্ষ জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে স্টাফ স্পেশাল ট্রেন ছাড়া মেদিনীপুর-হাওড়া, বেলদা-হাওড়া, দীঘা-হাওড়া এই তিনটি লোকাল ট্রেন চালু করার ব্যবস্থা করবেন এবং সমস্ত স্টেশনের টিকিট কাউন্টার থেকে সাধারণ যাত্রীদের টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং তারা চেষ্টা করবেন যাতে সমস্ত লোকাল ট্রেন চালু করা যায়। এ ছাড়াও সমস্ত লোকাল ট্রেন চালু করার বিষয়টিও খতিয়ে দেখবেন।

পানীয় জলের দাবিতে মহিলা বিক্ষোভ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ি-বাড়ি নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ এবং সুষ্ঠু জলনিকাশির দাবিতে 'মহিলা জনকল্যাণ সমিতি'র উদ্যোগে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে সহস্রাধিক মানুষের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি দেওয়া হয় ৪ অক্টোবর। তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com